



আদিবাসী অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা: বৈষম্য, চ্যালেঞ্জ ও উন্নয়নের পথ

Soumitra Bera

Email: ismsoumitra@gmail.com

সারসংক্ষেপ :

আদিবাসী অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা আজও বহুমাত্রিক বৈষম্য, কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের দ্বারা প্রভাবিত। ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা মূলস্রোতের সমাজ থেকে পৃথক হওয়ায় শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে তাদের স্বাভাবিক সংযোগ প্রায়শই দুর্বল থেকে যায়। ভৌগোলিক দুর্গমতা, দারিদ্র্য, পরিকাঠামোর অভাব, ভাষাগত বাধা এবং শিক্ষক-সংকট—এসব কারণে বহু শিশু নিয়মিত বিদ্যালয়ে যেতে পারে না অথবা প্রাথমিক স্তরেই পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। পাশাপাশি, বিদ্যালয়গুলোতে মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা, ছাত্রীসুলভ স্যানিটেশন, ডিজিটাল সুবিধা এবং সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের অভাব শিক্ষার গুণমানকে বাধাগ্রস্ত করে।

তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একলব্য মডেল স্কুল, আবাসিক হোস্টেল, কস্তুরবা বিদ্যালয়, ডিজিটাল ক্লাসরুম, সোলার-ভিত্তিক ল্যাব এবং এনজিওদের উদ্যোগ আদিবাসী শিক্ষায় নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। গবেষণাপর্বে স্পষ্ট যে মাতৃভাষা, সাংস্কৃতিক পরিচয়, স্থানীয় জ্ঞানের ব্যবহার এবং প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাপদ্ধতি একত্রে প্রয়োগ করা গেলে শিক্ষার মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। তাই আদিবাসী অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন মূলত সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি, সংস্কৃতিসংবেদনশীল নীতি এবং সামাজিক অংশগ্রহণের ওপর নির্ভরশীল।

মূলশব্দ: আদিবাসী শিক্ষা, ভাষাগত বৈষম্য, দারিদ্র্য ও পরিকাঠামো, মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা, উন্নয়নমূলক কৌশল।

ভূমিকা:

ভারতবর্ষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের অন্যতম প্রধান ধারা হলো আদিবাসী সম্প্রদায়। ভারতের বহু হাজার বছরের সভ্যতার ইতিহাসে এরা এক অনন্য সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে—যার মধ্যে রয়েছে প্রকৃতিনির্ভর জীবনযাপন, দলগত ঐক্য, সমষ্টিনির্ভর অর্থনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, লোকশিল্প, নৃত্য, সংগীত, এবং নিজস্ব ভাষা ও উপভাষার সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। এই সম্প্রদায়ের জীবনধারা আধুনিক মূলস্রোতের সমাজের ভোগবাদী, বাজারচালিত ও প্রতিযোগিতামূলক প্রবণতা থেকে অনেকটাই পৃথক। তাদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক, পারস্পরিক সহযোগিতা, সাম্প্রদায়িক বন্ধন এবং ঐতিহ্যগত জ্ঞানব্যবস্থা—যা বহু ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিকতার প্রভাবে বিকৃত হলেও আজও তাদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

কিন্তু জীবনধারা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য যতই সমৃদ্ধ হোক না কেন, শিক্ষা প্রাপ্তির প্রশ্নে আদিবাসী সমাজ আজও তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে রয়েছে। আধুনিক সভ্যতা যে প্রাথমিক শিক্ষাকে মানবোন্নয়নের সবচেয়ে ভিত্তিগত উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, সেই শিক্ষা আদিবাসী অধ্যুষিত বহু অঞ্চলে এখনো অপ্রতুল, অসম এবং নানা বৈপরীত্যে পূর্ণ। প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও শিক্ষক নেই; শিক্ষক থাকলেও ভাষাগত ব্যবধান; বিদ্যালয় আছে কিন্তু পৌঁছানো যায় না; পাঠ্যক্রম আছে কিন্তু সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য নেই—এমন বৈষম্য প্রতিটি স্তরে দৃশ্যমান।

সামাজিক বৈষম্য এই বঞ্চনার প্রথম স্তর। দীর্ঘদিন ধরে আদিবাসীদের সমাজে ‘পিছিয়ে পড়া’ বা ‘উন্নয়নের অযোগ্য’ হিসেবে দেখানোর যে প্রবণতা তৈরি হয়েছে, সে মনোভঙ্গি আজও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, সামাজিক আচরণ এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশে প্রভাব ফেলছে। এর ওপর রয়েছে অর্থনৈতিক দারিদ্র্য—যা পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে ব্যস্ত রাখে। ফলে শিক্ষার মতো দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের গুরুত্ব তাৎক্ষণিকভাবে সামনে আসে না। তদুপরি, আদিবাসী অঞ্চলগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান—পাহাড়ি এলাকা, ঘন বনভূমি, নদী-নালা, কাঁচা রাস্তা—শিক্ষালাভের পথকে আরও কঠিন করে তোলে। মৌসুমি বর্ষা, পরিবহন-অপর্যাপ্ততা, পরিকাঠামোর অনুন্নয়ন বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতিকে বাধাগ্রস্ত করে।

অন্যদিকে, প্রশাসনিক অবহেলা—যা কখনো জনবল সংকট, কখনো পরিকাঠামো উন্নয়নের ধীরগতি, আবার কখনো নীতি বাস্তবায়নের অভাবে স্পষ্ট—আদিবাসী শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যাকে দীর্ঘস্থায়ী করেছে। প্রকল্প থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে তার ব্যবহার, পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণে ঘাটতি দেখা যায়। সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতাও শিক্ষার পথে বড় বাধা। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের অভাব, পাঠ্যে আদিবাসী ইতিহাস-সংস্কৃতির যথেষ্ট প্রতিফলন না থাকা, এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে স্থানীয় জীবনযাপনের বাস্তবতা অনুপস্থিত থাকা—সব মিলিয়ে শিশুদের কাছে বিদ্যালয়কে ‘বহিরাগত বিশ্ব’ বলে মনে হয়। এই সংকট তাদের শিক্ষার প্রতি অনীহা, ভীতি এবং আত্মবিশ্বাসহীনতার জন্ম দেয়। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা অনেক পরিবারের কাছে আজও একরকম বিলাসিতা—যা চাইলেই অধিকার হিসেবে পাওয়া যায় না; বরং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জন করতে হয়।

সামাজিক বৈষম্যের শিকড়: শিক্ষার পথে অদৃশ্য বাধা

আদিবাসী অঞ্চলে শিক্ষার যে বৈষম্য আমরা দেখি, তার শিকড় লুকিয়ে আছে সমাজের গভীর কাঠামোয়। বহু শতাব্দী ধরে আদিবাসী মানুষদেরকে মূলস্রোতের সমাজে “পিছিয়ে পড়া”, “অশিক্ষিত”, “অসভ্য”, কিংবা “বনে-জঙ্গলে বসবাসকারী” বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ভুল ধারণা কেবল সামাজিক আচরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত, বিদ্যালয়ের মনোভাব, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, এমনকি পাঠ্যক্রম তৈরিতেও অদৃশ্যভাবে প্রভাব ফেলে। ফলে আদিবাসী শিশুরা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার মুহূর্ত থেকেই যেন একটি অদৃশ্য বৈষম্যের দেয়ালের মুখোমুখি হয়।

সামাজিক বৈষম্যের প্রধান রূপ—

- **ভাষাগত বৈষম্য:** সাঁওতালি, কুরুখ, মুন্ডারি, কোল, সাভর, ভিল, লোথা—এমন বহু আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা ও উপভাষা রয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সাধারণত বাংলায় বা হিন্দিতে হয়, যা শিশুদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন। ফলে তারা নিজের ভাষা ছেড়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এই ভাষাগত দূরত্ব শিশুদের মনে পাঠশালার প্রতি ভীতি, অনাগ্রহ ও আত্মবিশ্বাসের অভাব সৃষ্টি করে। প্রাথমিক স্তরেই যখন শিশুরা নিজেদের ‘অযোগ্য’ মনে করতে শুরু করে, তখন শিক্ষাজীবন হোঁচট খাওয়াই স্বাভাবিক।

- **জাতপাত ও সামাজিক দূরত্ব:** যদিও আইনগতভাবে জাতপাতের বৈষম্য নিষিদ্ধ, কিন্তু বাস্তব জীবনে তার প্রভাব অনেক ক্ষেত্রেই প্রবল। কিছু অঞ্চলে দেখা যায়—যেসব শিক্ষক মূলধারার সমাজ থেকে আসেন, তারা আদিবাসী পাড়ায় নিয়মিত যেতে অনিচ্ছুক, ফলে অনুপস্থিতি বাড়ে। অভিভাবক-শিক্ষক সমন্বয়ও দুর্বল হয়ে পড়ে, কারণ অভিভাবকরা নিজেদের সামাজিকভাবে ‘নিম্ন’ মনে

করে বিদ্যালয়ের কাজে এগোতে দ্বিধা করেন। এই দূরত্ব শিশুদের মনে বিদ্যালয় সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি করে।

• **সাংস্কৃতিক ভুল-বোঝাবুঝি:** বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম, মূল্যায়ন পদ্ধতি, উৎসব-অনুষ্ঠান—সবই মূলত মূলশ্রোতের সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি। আদিবাসী সমাজের ইতিহাস, লোককথা, জীবনযাপন, কৃষিকাজ, শিকার-সংগ্রহ, নৃত্য-সংগীত, বা ধর্মীয়-আচার পাঠ্যক্রমে খুব কমই প্রতিফলিত হয়। ফলে শিশুদের কাছে বিদ্যালয় হয়ে ওঠে এক ধরনের ‘বহিরাগত জগৎ’—যেখানে তারা নিজেদের পরিচয় খুঁজে পায় না। এর ফলে পড়াশোনার প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ কমে যায়।

অর্থনৈতিক বৈষম্য ও দারিদ্র্যের বৃত্ত: আদিবাসী সমাজে দারিদ্র্য শুধু আর্থিক সংকট নয়, এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী বৃত্ত, যা শিক্ষার সুযোগকে ক্রমাগত সীমিত করে। পরিবারের দৈনন্দিন সংগ্রাম শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। অনেক শিশুই প্রাথমিক স্তরে ভর্তি হলেও নিয়মিত স্কুলে যেতে পারে না, কারণ পরিবারের টিকে থাকার লড়াইয়ে তাদের শ্রমই হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। মৌসুমি কৃষিকাজ, জঙ্গলের ফল-মূল-কাঠ সংগ্রহ, গৃহকর্ম—এসব কাজে শিশুদের অংশগ্রহণ পরিবারের কাছে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

এছাড়া বিদ্যালয়ে পৌঁছাতে প্রায়ই কয়েক কিলোমিটার পথ হেঁটে যেতে হয়, যা ছোটদের জন্য কষ্টকর। পর্যাপ্ত পোশাক, ব্যাগ, খাতা-কলম, বই ও জুতোর মতো মৌলিক শিক্ষাসামগ্রী কেনার সামর্থ্য অনেক পরিবারেই থাকে না। ফলে বিদ্যালয়ে যাতায়াত এবং পড়াশোনার ব্যয় তাদের কাছে বাড়তি বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এর সাথে যুক্ত আছে আরেকটি বড় সমস্যা—শিক্ষাকে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ হিসেবে দেখা হয়, কিন্তু পরিবারের অবস্থা এতটাই অনিশ্চিত যে তাৎক্ষণিক আয়ই হয়ে ওঠে প্রধান অগ্রাধিকার।

এই বাস্তবতার ফলে বেশিরভাগ পরিবারে “শিক্ষা বনাম বেঁচে থাকা”—র দ্বন্দ্ব বেঁচে থাকাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়, আর শিশুদের শিক্ষাজীবন বাধাগ্রস্ত হয়। অর্থনৈতিক বৈষম্য ও দারিদ্র্যের এই ঘূর্ণাবর্ত আদিবাসী শিশুদের শিক্ষাগত অগ্রগতিকে দিনের পর দিন পিছিয়ে দেয়।

ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা: আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন সমৃদ্ধ ও মনোরম, তেমনি তা শিক্ষার ক্ষেত্রে এক বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ঘন অরণ্য, উঁচুনিচু পাহাড়ি ভূমি, নদী-নালা, কাদা ও ধুলোমাখা কাঁচা পথ—এসব মিলিয়ে স্কুলে নিয়মিত যাতায়াতই শিশুদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে বর্ষাকালে যখন প্রাকৃতিক বৈরিতা বাড়ে, তখন এই সমস্যাগুলি আরও তীব্র রূপ নেয়। ফলে শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ থাকলেও বাস্তব পরিস্থিতির কারণে অনেক শিশুই বিদ্যালয়ে পৌঁছাতে পারে না।

ভৌগোলিক চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে অন্যতম হলো বর্ষায় নদীর ঢল। অনেক গ্রামেই ছোট বড় নদী পেরিয়ে স্কুলে যেতে হয় এবং বর্ষায় এসব নদী ফুলে ওঠে, ফলে বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পাহাড়ি গ্রামগুলিতে অপর একটি সমস্যা হলো বিদ্যালয়ের সংখ্যা কম, অথচ বসতিগুলি দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে। তাই ছোট ছোট শিশুদের দীর্ঘ ও দুর্গম পথ অতিক্রম করে স্কুলে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এছাড়া অধিকাংশ এলাকায় বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগের ঘাটতি রয়েছে। ডিজিটাল শিক্ষার যুগে যেখানে অনলাইন ক্লাস, স্মার্ট ক্লাসরুম, ই-রিসোর্স ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, সেখানে এই মৌলিক অবকাঠামোর অভাবে আদিবাসী এলাকার শিশুরা আরও পিছিয়ে পড়ছে।

এই বাস্তব পরিস্থিতির মোকাবিলায় স্থানীয় বিদ্যালয়গুলিকে প্রায়শই নিজস্ব কৌশল তৈরি করতে হয়—যেমন মোবাইল টিচিং, বিকল্প সময়সূচি, বাড়ি-বাড়ি শিক্ষাসহায়ক উদ্যোগ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক নীতি ও সরকারি পরিকল্পনার অনেক ক্ষেত্রেই এই ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও প্রতিবন্ধকতাগুলি যথাযথ গুরুত্ব পায় না। ফলে ক্ষেত্রবিশেষে নীতিনির্ধারণ ও বাস্তব চাহিদার মধ্যে এক বৈষম্য তৈরি হয়, যা শিক্ষাকে আরও জটিল করে তোলে।

বিদ্যালয় কার্ঠামো: অপ্রতুল পরিকাঠামো ও জনবল সংকট: আদিবাসী অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম বড় বাধা হলো বিদ্যালয়গুলির অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো ও জনবল সংকট। উন্নয়নের ধারায় ভারত অনেক দূর এগোলেও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার বহু বিদ্যালয় এখনও মৌলিক সুবিধাবঞ্চিত। ফলে শিক্ষার্থীদের শেখার পরিবেশ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি শিক্ষকদের ওপর বাড়তি দায়িত্ব ও চাপ সৃষ্টি হয়। একটি কার্যকর, নিরাপদ ও আকর্ষণীয় স্কুল পরিবেশ শিক্ষার মান বাড়াতে অপরিহার্য; কিন্তু এই এলাকাগুলোর বাস্তবতা সেই প্রত্যাশার কাছাকাছি পৌঁছতে পারেনি।

- **পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষের অভাব:** অনেক স্কুলেই শ্রেণিকক্ষ সংখ্যা শিক্ষার্থীর তুলনায় কম। একই ঘরে একাধিক শ্রেণির পাঠদান করতে হয়। এতে শিক্ষাদানের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মনোযোগ বিভক্ত হয়।

- **শিক্ষকের সংখ্যায় ঘাটতি:** বহু বিদ্যালয়ে মাত্র এক বা দুই শিক্ষক কর্মরত থাকেন, যাঁদের একাই বহু শ্রেণি সামলাতে হয়। ফলে শিক্ষার গুণগত মান কমে, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান অসম্ভব হয়ে ওঠে।

- **মিড-ডে-মিল রান্নাঘরের অপ্রতুলতা:** অনেক স্কুলে রান্নার ঘর ছোট, স্বাস্থ্যকর নয়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ঘাটতি থাকে। ফলে পুষ্টিকর খাবার প্রদান ব্যাহত হয়, যা শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতিকে প্রভাবিত করে।

- **ছাত্রীদের জন্য আলাদা শৌচাগারের অভাব:** এই সমস্যা কিশোরী ছাত্রীদের স্কুলে আসা কমিয়ে দেয়। স্বাস্থ্যবিধি-সংক্রান্ত সুবিধা না থাকলে তারা পাঠ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।

- **শিক্ষাসামগ্রী ও ডিজিটাল সরঞ্জামের অভাব:** ব্ল্যাকবোর্ড, চার্ট, লাইব্রেরি বই, প্রজেক্টর, কম্পিউটার—এমনকি সাধারণ কলম-খাতা পর্যন্ত অনেক স্কুলে যথেষ্ট নেই। ডিজিটাল শিক্ষার যুগে এই বৈষম্য শিক্ষার্থীদের আরও পিছনে ঠেলে দেয়।

পরিকাঠামো উন্নয়ন একটি দীর্ঘমেয়াদি সরকারি প্রক্রিয়া হলেও এর অভাবের প্রভাব তাৎক্ষণিক—শিক্ষার্থীরা শেখার উপযোগী পরিবেশ পায় না, শিক্ষকেরা সংকটের মধ্যে কাজ করেন এবং স্কুলের মান সামগ্রিকভাবে কমে যায়। তাই প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে পরিকাঠামো উন্নয়নকে অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখতে হবে।

ভাষাগত চ্যালেঞ্জ: মাতৃভাষা-ভিত্তিক শিক্ষার অভাব: আদিবাসী শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষা একটি মৌলিক ও অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়। ভারতের অধিকাংশ আদিবাসী সম্প্রদায়ের নিজস্ব মাতৃভাষা রয়েছে—সাঁওতালি, কুরুখ, মুন্ডারি, হো, লোথা, কোল, ভিল, সাভার প্রভৃতি ভাষা-উপভাষা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় বহন করে এসেছে। এই ভাষাগুলি শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং তাদের জ্ঞানব্যবস্থা, পুরাণ, কাজের ধারা, গান, নাচ, আচার-অনুষ্ঠান—সবকিছুর কেন্দ্র। কিন্তু বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই শিশুদের ভাষাগত জগৎ ভেঙে যায়, কারণ তারা এমন একটি ভাষায় পড়তে বাধ্য হয় যা তাদের মানসিক পরিসরের বাইরে। ফলস্বরূপ শিক্ষা তাদের কাছে কঠিন, পরিত্যাজ্য এবং ভীতিকর হয়ে ওঠে।

- **মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তকের অভাব:** বিদ্যালয়ের পাঠ্যসামগ্রী প্রায়শই আঞ্চলিক সরকারি ভাষায় (যেমন বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া) তৈরি হয়, যেখানে আদিবাসী মাতৃভাষার ব্যবহার নেই। ফলে শিশুরা বই খুলেই বিভ্রান্ত হয়—শব্দগুলো তাদের পরিচিত নয়, ধ্বনি-রীতি আলাদা, বাক্যের গঠন অচেনা।

- **শিক্ষকদের ভাষাজ্ঞান সীমিত:** অধিকাংশ শিক্ষকই স্থানীয় আদিবাসী ভাষা জানেন না। ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী যোগাযোগ দুর্বল হয়। শিশুর ভুল বোঝাবুঝি কাটাতে বা সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা দিতে শিক্ষক অসহায় হয়ে পড়েন। শিশুরা নিজের ভাষায় প্রশ্ন করতে সাহস পায় না, শিক্ষকও বুঝতে পারেন না কীভাবে তাদের বোঝানো যায়।

- **ভাষাগত দূরত্বে শিশুর আত্মবিশ্বাসহীনতা:** নিজের মাতৃভাষায় দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও স্কুলে এসে তারা ভুল বোঝাবুঝির কারণে ‘অযোগ্য’ বা ‘কমজোর’ বলে পরিচিত হয়। এই মানসিক আঘাত শিক্ষার প্রতি অনীহা সৃষ্টি করে। তারা মনে করে, “স্কুলের ভাষা আমার নয়, তাই স্কুলও আমার জায়গা নয়।”

• **শিক্ষার প্রাথমিক ধাপেই বাদ পড়ার প্রবণতা:** ভাষাগত অস্বস্তির কারণে অনেক শিশু ক্লাসে মনোযোগ দিতে পারে না, দিনের পর দিন অগ্রগতি হয় না, এবং ক্রমে বিদ্যালয় ছেড়ে দেয়। ড্রপআউটের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায় এই ভাষাগত বৈষম্য।

মাতৃভাষা-ভিত্তিক শিক্ষা শুধু ভাষার প্রশ্ন নয়; এটি শিক্ষার মান, শিশুদের আত্মপরিচয়, জ্ঞানগঠন ও সাংস্কৃতিক সুরক্ষার প্রশ্ন। তাই প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার ব্যবহার বাড়ানো, বহুভাষিক শিক্ষক নিয়োগ, এবং দ্বিভাষিক বা ত্রিভাষিক শিক্ষামডেল চালু করা অত্যন্ত জরুরি। এটি কেবল শিক্ষার ফলাফল উন্নত করবে না, বরং শিশুদের মনে বিদ্যালয়ের প্রতি আস্থা ও নিজেদের সাংস্কৃতিক মর্যাদার অনুভূতিও জাগিয়ে তুলবে।

উন্নয়নের পথ: একটি সর্বাঙ্গীণ রোডম্যাপ

আদিবাসী অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো পুনর্গঠন কোনো একক পদক্ষেপে সম্ভব নয়; এর জন্য প্রয়োজন বহুস্তরীয় সমন্বিত পরিকল্পনা, সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা, স্থানীয় বাস্তবতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং রাষ্ট্র-সমাজ-বিদ্যালয়ের সম্মিলিত অংশগ্রহণ। নিম্নে একটি সমন্বিত রোডম্যাপ তুলে ধরা হলো, যা আদিবাসী শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশল হিসেবে কার্যকর হতে পারে।

মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা: শিক্ষার প্রথম সোপানকে সহজ ও বোধগম্য করা: আদিবাসী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় সবচেয়ে বড় বাধাগুলোর অন্যতম হলো ভাষাগত দূরত্ব। শিশুর জ্ঞানার্জনের প্রথম ধাপ হয় তার মাতৃভাষার মাধ্যমে; ভাষাই তার চিন্তা, অনুভব, অভিজ্ঞতা এবং বোধের ভিত্তি। বিদ্যালয়ের ভাষা যখন এই মাতৃভাষার সঙ্গে মেলে না, তখন শিশু শিখনপ্রক্রিয়ায় বিচ্ছিন্ন বোধ করে এবং শিক্ষাকে বোঝার পরিবর্তে মুখস্থ করার প্রবণতা তৈরি হয়।

এই সমস্যার সমাধানে মাতৃভাষাভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরি। প্রাথমিক স্তরে সাঁওতালি, কুরুখ, মুন্ডারি, ওরাঁও, হনুভাষা ইত্যাদি ভাষায় পাঠ তৈরি করলে শিশু তার নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিষয়বস্তুকে মিলাতে পারে। একই সঙ্গে স্থানীয় ভাষাজ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ না হলে মাতৃভাষায় পাঠদান বাস্তবে রূপ পাবে না। স্থানীয় কমিউনিটি থেকে শিক্ষক নির্বাচন করলে শুধু ভাষাগত সুবিধাই নয়—বিদ্যালয়, পরিবার ও সমাজের মধ্যে একটি আস্থা-সেতু তৈরি হয়। এর ফলে শিশুর উপস্থিতি, আগ্রহ ও শেখার গতি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা তখন ‘অচেনা কাঠামো’ নয়, বরং শিশুর জীবনের সঙ্গে মিশে থাকা একটি স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে।

পরিকাঠামো ও পরিবহন উন্নয়ন: বিদ্যালয়কে সুলভ ও নিরাপদ করা: শিক্ষার মানোন্নয়নে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোকে উপেক্ষা করা যায় না। আদিবাসী অঞ্চলের বহু বিদ্যালয়ে এখনও পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ নেই; ছাদ চুঁইয়ে জল পড়ে; বেষ্ট-ডেস্কের অভাব; মেয়েদের জন্য আলাদা স্যানিটেশন নেই। এই পরিকাঠামোগত দুর্বলতা শিশুদের আগ্রহহীন করে তোলে এবং অভিভাবকদের মনে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করে।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রতিটি বড় গ্রামের মধ্যে ছোট পরিসরের স্যাটেলাইট স্কুল স্থাপন করা যেতে পারে, যাতে শিশুদের দীর্ঘ পথ হাঁটতে না হয়। বিশেষত দুর্গম ও পাহাড়ি অঞ্চলে ছাত্র পরিবহন ব্যবস্থা বা সাইকেল সহায়তা প্রকল্প অত্যন্ত কার্যকর। মেয়েদের বিদ্যালয়ত্যাগ রোধে জেন্ডার-সেন্সিটিভ স্যানিটেশন আবশ্যিক; নিরাপদ শৌচাগার না থাকলে তারা নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসতে সাহস পায় না। পরিকাঠামোর উন্নয়ন শুধু শিক্ষাকে আরামদায়ক করে না—এটি শিশুদের মনে একটি বার্তা দেয় যে শিক্ষা তাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ এবং সমাজ তাদের শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করে।

ডিজিটাল শিক্ষা ও প্রযুক্তির সংযোগ: দূরত্ব ও তথ্যের ব্যবধান কমানো: ডিজিটাল যুগের শিক্ষা শুধু শহুরে অঞ্চলের জন্য সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। আদিবাসী অঞ্চলে বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেটের ঘাটতি ডিজিটাল শিক্ষার বড় বাধা হলেও এর সমাধান হিসেবে

সোলার-পাওয়ার চালিত ডিজিটাল ল্যাব অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে। সৌরবিদ্যুৎ-নির্ভর বিদ্যালয়গুলো দিনের পর দিন নিরবচ্ছিন্নভাবে ডিজিটাল পাঠ চালাতে পারে।

ইন্টারনেট না থাকলেও অফলাইন কনটেন্ট-লোডেড ট্যাব বা স্মার্ট ডিভাইস দিয়ে শিশুদের অ্যানিমেটেড ক্লাস, স্থানীয় ভাষায় ভিডিও টিউটোরিয়াল, গল্প, বিজ্ঞান-গণিতের প্রাথমিক ধারণা শেখানো যেতে পারে। এতে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, জটিল বিষয়বস্তু সহজ হয় এবং শিশুদের চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীলতা গড়ে ওঠে। ডিজিটাল শিক্ষা আদিবাসী অঞ্চলকে “তথ্যগতভাবে বিচ্ছিন্ন” রাখা থেকে মুক্তি দিতে পারে।

অভিভাবক-সমাজকে সম্পৃক্ত করা: সম্প্রদায়ের মালিকানা গড়ে তোলা: আদিবাসী সমাজে শিক্ষার প্রতি অনীহা অনেক সময় দারিদ্র্য, কাজের চাপ, এবং বিদ্যালয়ের সঙ্গে দুর্বল যোগাযোগের ফল। তাই শুধু শিশুকে নয়, পরিবারকেও শিক্ষার প্রক্রিয়ার অংশ করা জরুরি। বিদ্যালয়ের স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে স্থানীয় নেতৃত্ব—যেমন মুণ্ডা, গ্রামের প্রবীণ, মহিলাদের প্রতিনিধি—নিয়ে আসলে তারা বিদ্যালয়ের নীতিনির্ধারণে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেন।

প্রতি মাসে অভিভাবক-বিদ্যালয় সংলাপ আয়োজন করলে অভিভাবকরা শিক্ষার মূল্য, সরকারী সুবিধা, উপস্থিতির গুরুত্ব, এবং স্বাস্থ্য-পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হন। বিদ্যালয় তখন কেবল একটি প্রতিষ্ঠান নয়—এটি সমাজের সম্মিলিত দায়িত্বে গড়ে ওঠা একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়।

পাঠ্যক্রমে স্থানীয় ইতিহাস-সংস্কৃতি যুক্ত করা: শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করা: শিক্ষা যখন শিশুদের বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, তখন তা ‘শুকনো জ্ঞান’ হয়ে যায়। আদিবাসী শিশুদের জন্য পাঠ্যক্রমে স্থানীয় নাচ, গান, লোককথা, শিকার-সংগ্রহ-চাষের জ্ঞান, উৎসব ও ইতিহাস যুক্ত করলে তারা নিজেদের পরিচয়কে শ্রদ্ধা করতে শেখে। তাদের সাংস্কৃতিক জ্ঞানকে শিক্ষার অংশ করা হলে পাঠশালা তাদের কাছে পরিচিত ও আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে।

সাঁওতাল নৃত্য, কারাম পরব, সিধো-কানহর ইতিহাস, জুম চাষের পদ্ধতি বা বনসম্পদ সম্পর্কিত লোকজ বুদ্ধিমত্তা—এসব যদি পাঠ্যক্রমে স্থান পায়, তাহলে শিক্ষা ‘জীবন থেকে শিখি এবং জীবনের জন্য শিখি’-এর বাস্তব রূপ লাভ করে। এই সামগ্রিক পাঠ্যক্রম শিশুর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে এবং নিজের সম্প্রদায়কে মর্যাদার সঙ্গে দেখতে শেখায়।

ভবিষ্যতের দিগন্ত: উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনা

আদিবাসী শিক্ষার বর্তমান পরিসর নিছক প্রাথমিক নির্দেশনা বা সঙ্কুচিত সুযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি আজ এক নতুন পরিবর্তনের যুগের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দেশজুড়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সক্রিয় ভূমিকা, এবং প্রযুক্তির বহুমাত্রিক অগ্রগতি মিলিতভাবে আদিবাসী শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করছে। যে অঞ্চল একসময় বিদ্যালয়, শিক্ষক ও শিক্ষাসামগ্রীর অভাবে পিছিয়ে পড়েছিল, আজ সেই অঞ্চলেই শিক্ষার নতুন দিগন্ত দৃশ্যমান হচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে একলব্য মডেল রেসিডেনশিয়াল স্কুল, কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়, আদিবাসী ছাত্রাবাস, ডিজিটাল স্মার্ট ক্লাসরুম, এবং আবাসিক শিক্ষা-কেন্দ্র—এসব উদ্যোগ আদিবাসী শিক্ষাকে আরও বিস্তৃত ও সুসংগঠিত করে তুলছে। একলব্য স্কুলগুলো দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলের প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীদের উচ্চমানের আবাসিক শিক্ষা প্রদান করছে, যেখানে আধুনিক বিজ্ঞান, খেলাধুলা, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং সাংস্কৃতিক চর্চা—সবই একত্রে রয়েছে। কস্তুরবা বিদ্যালয়গুলো বিশেষভাবে কন্যাশিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে, যা মেয়েদের বিদ্যালয়ত্যাগের হার কমিয়ে ভবিষ্যতের সমাজশক্তি হিসেবে তাদের গড়ে তুলছে।

প্রযুক্তি এই পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু। বর্তমানে ডিজিটাল ক্লাসরুম, ভিডিও লার্নিং, অ্যানিমেটেড কনটেন্ট, অফলাইন ট্যাব, সোলার-পাওয়ারড কম্পিউটার ল্যাব—এসব উদ্যোগ শিক্ষার গুণমানকে এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে। এমনকি যেখানে ইন্টারনেট নেই, সেখানে অফলাইন সার্ভার বা LAN-ভিত্তিক ডিজিটাল কনটেন্টের সাহায্যে শিশুদের আকর্ষণীয় পাঠদান সম্ভব হচ্ছে। ফলে শিক্ষার অভিজ্ঞতা আর শুধুমাত্র বই-খাতায় সীমাবদ্ধ নয়; এটি আরও বোধগম্য, আনন্দদায়ক ও বহুমাত্রিক হয়ে উঠছে।

তবে শিক্ষার উন্নয়ন শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত উন্নতির উপর নির্ভর করে না; এর মূল শক্তি নিহিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতায়। বিশ্বব্যাপী গবেষণায় দেখা যাচ্ছে—যেসব শিক্ষাব্যবস্থা মাতৃভাষাকে ভিত্তি, সংস্কৃতিকে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র, জীবিকানির্ভর জ্ঞানকে বাস্তব শিক্ষা, এবং আধুনিক টেকনোলজিকে পরিপূরক শক্তি হিসেবে গ্রহণ করে, সেগুলোই শিশুদের শিক্ষাগত সাফল্যে সর্বোচ্চ ফলাফল দেয়। কারণ শিক্ষা তখন শিশুর অভ্যন্তরীণ জগৎ এবং বহির্বিশ্বের মধ্যে একটি স্বাভাবিক সেতু তৈরি করে। সে তখন শুধুমাত্র তথ্য শেখে না, নিজের বাস্তব জীবনের সঙ্গে সেই তথ্যকে মিলিয়ে চিন্তা করতে শেখে।

আদিবাসী শিক্ষার ভবিষ্যৎ তাই শুধু বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি এমন একটি সাংস্কৃতিক-সংবেদনশীল, প্রযুক্তিনির্ভর, অংশগ্রহণমূলক ও মানবিক শিক্ষাব্যবস্থা, যেখানে শিশু নিজেকে “অন্য কোনো ব্যবস্থার অনুগত অংশগ্রাহী” হিসেবে দেখে না; বরং নিজের পরিচয়, ভাষা, জ্ঞান ও সংস্কৃতিকে মর্যাদা দিয়ে শিক্ষার যাত্রায় অংশ নেয়।

এই ভবিষ্যৎ দিগন্ত এমন এক শিক্ষাদর্শনের কথা বলে—যেখানে বিদ্যালয় হয় সম্প্রদায়ের অংশ, যেখানে শিক্ষক হয় সংস্কৃতির সেতু, যেখানে প্রযুক্তি হয় সুযোগের সমান বন্টনকারী, এবং যেখানে আদিবাসী শিশু হয় নিজের সমাজের পরিবর্তন-কারক। তাৎপর্যপূর্ণ হলো—এই পরিবর্তন কোনো একক উদ্যোগ নয়; এটি একটি সম্মিলিত চেষ্টার ফল, যেখানে সরকার, সমাজ, পরিবার ও প্রযুক্তি একত্রে নতুন সম্ভাবনার পথ রচনা করছে।

অতএব, আদিবাসী শিক্ষার আগামী দিনের পথচলা নিঃসন্দেহে এক প্রবাহমান রূপান্তরের পথ। এই পথ যেখানে ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার সংলাপ ঘটে, যেখানে মূলস্রোতের শিক্ষা ও আদিবাসী জ্ঞান একে অপরকে সমৃদ্ধ করে, এবং যেখানে প্রতিটি শিশুর জন্য শিক্ষা হয়ে ওঠে স্বাধীনতা, আত্মনির্ভরতা ও মর্যাদার উৎস।

উপসংহার:

আদিবাসী অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা কেবল বিদ্যালয় গড়ে তোলার কাজ নয়; এটি সামাজিক ন্যায়, মানবিক সমতা এবং সাংস্কৃতিক মর্যাদা পুনর্গঠনের গভীর প্রক্রিয়া। শিক্ষার সার্থকতা তখনই অর্জিত হবে যখন বিদ্যালয় আদিবাসী সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে, শিক্ষক হবেন সংবেদনশীল ও ভাষাগতভাবে সক্ষম, অভিভাবক ও সম্প্রদায় হবেন সক্রিয় সহযোগী, এবং প্রশাসন হবে জবাবদিহিমূলক ও বাস্তবভিত্তিক। শিশুদের নিজেদের পরিচয় ও সংস্কৃতির গর্ব নিয়ে শেখার সুযোগ দিতে পারলেই শিক্ষা সত্যিকার অর্থে মুক্তির পথ খুলে দেয়। তাই আদিবাসী শিক্ষার অগ্রগতি শুধু শিক্ষার প্রসার নয়—এটি সামগ্রিক মানবিক উন্নয়নের এক দীর্ঘ, সম্মানময় এবং সমতাভিত্তিক যাত্রা।

রেফারেন্স:

1. চট্টোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী। (২০১৮). *ভারতীয় আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি*. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।
2. মুরি, সুকুমার। (২০১৭). *আদিবাসী শিক্ষার সংকট ও সম্ভাবনা*. বর্ধমান: পূর্বাঞ্চল প্রকাশন।
3. সিং, রমেশচন্দ্র। (২০২০). *জনজাতি শিক্ষায় ভাষাগত বাধা ও মাতৃভাষা-ভিত্তিক শিক্ষা*. রাঁচি: বাড়খণ্ড শিক্ষা উন্নয়ন পর্যদ।

4. শর্মা, মনোজ। (২০১৭). আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো: একটি ক্ষেত্রসমীক্ষা. কলকাতা: বঙ্গ শিক্ষা গবেষণা কেন্দ্র।
5. রায়, তপনকুমার। (২০১৬). আদিবাসী শিশু ও শিক্ষা: ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার প্রভাব. পাসচিমবঙ্গ সমাজবিজ্ঞান পত্রিকা, ১২(৪), ৫৮-৭৪।
6. ভারত সরকার, ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক। (২০২১). একলব্য মডেল রেসিডেনশিয়াল স্কুল: বার্ষিক প্রতিবেদন. নয়া দিল্লি: ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক।
7. দাস, অরুণ। (২০১৮). আদিবাসী শিক্ষায় সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা ও বিদ্যালয় পরিচালনা. শিক্ষা ও সমাজ, ১৫(২), ৪৪-৫৯।
8. ওরাওঁ, নলিনী। (২০২২). আদিবাসী অঞ্চলে ডিজিটাল শিক্ষা: চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ পথরেখা. রাঁচি: সেন্ট্রাল ট্রাইবাল এডুকেশন ইনস্টিটিউট।
9. বিশ্বব্যাংক। (২০১৫). ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি: একটি নীতিগত বিশ্লেষণ. নয়া দিল্লি অফিস।
10. মজুমদার, কল্পনা। (২০১৪). নারী ও কন্যাশিক্ষা: আদিবাসী সমাজে বৈষম্যের রূপ. কলকাতা: রূপকথা প্রকাশনী।

Citation: Bera. S., (2025) “আদিবাসী অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা: বৈষম্য, চ্যালেঞ্জ ও উন্নয়নের পথ”, *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-01, January-2025.